জীবনের সন্ধানে

প্রবন্ধ সংকলন

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

শিশু-শিক্ষা, শিশু-পুষ্টি ও মিড ডে মিল

- বদ্যিনাথের তীর্থদর্শন ১৭
- মিড ডে মিল - এক নতুন আশা, নতুন আলো ২৮
- প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রতি আবেদন ৩৪
- সুষম আহার, পুষ্টির প্রধান শর্ত ৩৬
- মিড ডে মিলে তিল ও তেল ৪২
- মিড ডে মিল, এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা ৪৩

উন্নত জীবনযাপন ও মতাদর্শের সন্ধানে (১)

- আদিগঙ্গার তীরে ৪৭
- মিনিবাস শ্রমিকদের জীবনচরিত ৫১
- রক্তদান না আত্মদান ৫৫
- জলের আর-এক নাম জীবন ৫৭
- অবাক জলপান ৬০
- জলের আর-এক নাম মরণ, জলে আর্সেনিক দূষণ ৬৩
- দুর্ঘটনা প্রতিদিনের ঘটনা ৬৬
- বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের পথে ৭০
- থ্যালেডোমাইড শিশু ৭৩
- ম্যালেরিয়া আবিষ্কারের শতবর্ষ ৭৪
- কাজে মন লাগে না, গতর চলে না ৭৭

উন্নত জীবনযাপন ও মতাদর্শের সন্ধানে (২)

- সুখী পরিবার? ৮১
- বাজারের শিক্ষা ৮৫
- মানবতার সন্ধানে ৮৯
- আধিপত্যের গতিপ্রকৃতি ৯১
- ভারসাম্যের সন্ধানে ৯৬
- সমাধান কোন্ পথে? ৯৯
- প্রচারের বিচার ১০৩
- চিকিৎসক দিবসের ভাবনা ১০৫
- সমাজতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্য অবিচ্ছেদ্য ১০৭
- প্রকৃতি ও মানুষ ১১০
- কী আনন্দ! ১১২

উপক্রমণিকা

প্রাথমিক শিক্ষার সার্থকতা কোন্ পথে? এই শিক্ষার বিগত শতাব্দীর সবটুকু সময় শিক্ষাবিদ, শিক্ষা-প্রশাসক আর অবশ্যই রাজনীতিবিদদের চিন্তাভাবনায় কেটে গেছে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে পা দিয়েও এখনও পর্যন্ত তার সার্থকতার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্বের অনেক দেশের 'মডেল' নিয়ে তাত্ত্বিকেরা নাড়াচাড়া করেছেন। বিদেশ থেকে অনেক বিশেষজ্ঞ এ দেশে এসেছেন। অধুনা বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, ব্রিটিশ ওভারসিজ শিক্ষা সংস্থার কল্যাণে ডি.পি.ই.পি.-র (পরিবর্তিত প্রকল্প—'সর্বশিক্ষা অভিযান') বকলমে কোটি কোটি টাকাও আসছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। তা সত্ত্বেও সার্থক প্রাথমিক শিক্ষা এখনও 'দূরঅস্ত'।

তা হলে খোঁজ করতে হয়— হারানো সূত্রটির। কী সেই 'জিয়ন কাঠি' যার স্পর্শে 'প্রাথমিক শিক্ষা' ফুলেফলে জীবন্ত হয়ে উঠবে ? সেই চাবিকাঠি কেউ জানতেন না, তা নয়! কিন্তু সাহস করে বলতে পারেননি— এই সেই 'সূত্র' যা পারে প্রাথমিক স্কুলের শত শত পড়ুয়াকে শামিল করতে স্কুল প্রাঙ্গণে।

আমাদের প্রিয়জন একান্ত কাছের মানুষ ডাক্তারবাবু (সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়) সেই হারানো সূত্রটি অতি সহজেই খুঁজে পেলেন প্রায় একদশক আগেই (১৯৯৪ সালে) বীরভূম জেলার সাজিনা গ্রামে রাধাকান্ত রায় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের পুষ্টির কথা চিন্তাভাবনা করতে করতে। জন্ম নিল এক অভূতপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব পরিকল্পনা— সপ্তাহে তিন-চারদিন একটি করে সিদ্ধ ডিম স্কুলের সব পড়ুয়াদের টিফিনের সময় হাতে তুলে দেওয়া। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ ডা. সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের। এর পরিকাঠামো ও আর্থিক দায়দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি ও তাঁর এক বন্ধু। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় মানুষ কতখানি সমাজ চেতনায় নিবেদিতপ্রাণ হলে এ ধরনের ঝুঁকি একাই নিতে সাহস করেন।

তার পর ইতিহাস। প্রকল্প প্রসারিত হয়েছে বাঁকুড়ার হরিয়ালগাড়া গ্রামে। শুরু হল এই দুটি বিদ্যালয় এবং পরবর্তী সময়ে বীরভূমের রূপপুর গ্রামের কিছু পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকল্পের প্রসারণ। 'পুষ্টি' সংস্থার সভাপতির কথায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় বছরে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। তাঁরই কথায়— " যেটা জোগাড় করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। শুধু প্রয়োজন উদ্যোগের। সেই উদ্যোগ একমাত্র সিদ্ধার্থ ছাড়া আমরা আর কেউই দেখাতে

পারিনি''। এর পর ডাক্তারবাবুর পরিচিত পরিজনদের কথা এসে পড়ে। তাঁদের সকলের মিলিত চেষ্টায় ১৯৯৫ সালে রূপ নিল 'পুষ্টি' সংগঠন। ছোট্ট একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। প্রকল্পের প্রথমে প্রতি স্কুলের জন্য ব্যয়ের দায়বদ্ধতা ছিল দশ হাজার টাকা। বর্তমানে সেটি বেড়ে হয়েছে তিরিশ হাজার টাকায়। অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বেড়ে চলে। সেটা তো আনন্দের কথা। কিন্তু সংগঠকেরা প্রমাদ গুনছেন, তাঁরা উর্ধ্বমুখী ব্যয়ের ধাক্কা সামলাবেন কীভাবে ? এই রাজ্যে তো অনেক সম্পদশালী এন.জি.ও. রয়েছে , তাদের তো এগিয়ে আসার কথা। কিন্তু তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ডাক্তারবাবু বাস্তববাদী, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহায়তা বিনা রাজ্যের প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্কুলের এক কোটি পড়ুয়াদের মধ্যে প্রকল্প প্রসারিত করা অলীক স্বপ্ন। সিদ্ধার্থবাবুর কথায় "আমরা তারই ভিত্তি স্থাপনে ব্রতী ''। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

স্বাভাবিক ভাবে সরকারি উদ্যোগে মিড ডে মিলের প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের টনকও নড়েছে। দেশের শীর্ষ আদালতের বলিষ্ঠ আদেশনামা—"All State Governments to provide cooked mid-day meals in all Government schools by January 2002."। কিছু রাজ্য সরকার আপত্তি করতে থাকেন সেই গতানুগতিক আর্থিক কারণ দেখিয়ে। তাদের মুখের ওপর তীব্র কশাঘাত বিচারক বি.এন.কিরপাল-এর— "We can not compromise on school meals."। এবং আরও বলেন— "Cut out the flab somewhere else."। আর যারা রান্না খাবার না দিয়ে শুকনো র‍্যাশান দিয়ে দায় সারছেন তাঁদের বলা হল— "These Governments .... must within three months start providing cooked meals in all Government and aided primary schools in half the districts of the State (in order of poverty) and must within a further period of three months extend the provision of cooked meals to the remaining parts of the state.

আজ ২০০৪-এর এপ্রিল মাস। এখন পর্যন্ত শীর্ষ আদালতের আদেশটি সারা দেশে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়নি। তবে 'পুষ্টি'-র মতো সংগঠনের ক্রমাগত নৈতিক চাপ আরও বাড়বে। আশা করা যায় সামাজিক চাপ বাড়বে। স্কুলের আহার ব্যাপারটি অনতি ভবিষ্যতে শতকরা একশোভাগ সফল রূপায়ণ হবেই। 'পুষ্টি'-র প্রস্তাব সরকার মিড ডে মিলের সঙ্গে একটা সিদ্ধ ডিম অথবা ডিম ও আলুর একটা সুস্বাদু তরকারি দিলে আহার ও পুষ্টি দুই বজায় থাকতে পারে। এই গঠনমুলক প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাজ্য সরকারগুলি মেনে নিন। সেটি সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের মনের কথা। মিড ডে মিল কি এতই অলীক প্রস্তাব যে যার জন্য এটিকে 'স্বপ্ন' বলতে হবে? না, আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে তামিলনাড়ু রাজ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই সময়েই দেখেছিলাম প্রতিটি প্রাথমিক

স্কুলে দ্বিপ্রহরে রান্না করা খাবার পরিবেশিত হচ্ছে। মনে পড়ে তপশিলী উপজাতি অধ্যুষিত একটি স্কুলে রান্না খাবার পরিবেশনের অপূর্ব দৃশ্যটি। চারপাশে উন্মুক্ত মাঠের এক দিকে জড়ো হয়েছেন বাচ্চাদের মায়েরা। তাঁরা দুনয়ন সার্থক করে দেখছেন তাঁদেরই ছেলেমেয়েদের ভাত-ডাল ও সবজির খিচুড়ি তৃপ্তির সঙ্গে খেতে। পরে শুনেছিলাম ওই অঞ্চলে ডাল-ভাত খাওয়ার সৌভাগ্য প্রতিদিন সব পরিবারের হয় না। কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেছিলাম সংগঠক তরুণীটিকে, বছরের কদিন এই খাবার দেওয়া হয়? অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই। ছুটির দিনও স্কুলের সব কচিকাঁচারা ঠিক দুপুর ১২টায় স্কুলের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়। স্কুলে উপস্থিতি নিয়ে কাউকে দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয় না।

এর অনেকদিন পর নরেন্দ্রপুর আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত শিশুকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় দেখেছিলাম প্রাক্-বিদ্যালয়ের কচিকাঁচারা যৎসামান্য খাবারও কত তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করছে। এই তৃপ্তি, বিদ্যা পরিবেশনের মাধ্যমটির প্রতিও আত্মীয়তার বন্ধনে তাদের যুক্ত করে দিয়েছে। বুঝেছিলাম এক সুদূরপ্রসারী আপ্তবাক্য— এই দেশে শিশু-পুষ্টি আর শিশু-শিক্ষাকে এক গ্রন্থিতে বাঁধতে না পারলে প্রাথমিকের 'সোনার হরিণটি' অধরাই থেকে যাবে। খাবার জন্যে স্কুল-না-পড়ার জন্য স্কুল, এই সব কূটকচালি তাঁরাই করেন যাঁদের না আছে শিশুদের প্রতি সহানুভূতি না আছে শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা!

স্বেচ্ছাব্রতী এক বিবেকবান চিকিৎসকের অসাধারণ অভিজ্ঞতাজাত মনের গহনে যে চিন্তাভাবনার ঢেউ আনাগোনা করে, তারই প্রকাশ ছোট বড় নানান লেখায়। ডিম প্রকল্পের মতোই বিস্ময়কর সেই সব আন্তরিক কথা। অক্লান্ত ডাক্তারবাবু লিখে চলেছেন, কোন্ এক সামাজিক দায়বদ্ধতার ঋণ শোধের জন্য সৃষ্টি হয়েছে ক্ষুদ্র হলেও বলিষ্ঠ জনমত। চোখ ফুটিয়েছে আমাদের মতো তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের। তত্ত্ব নয়, আন্তরিক প্রয়োগই চাবিকাঠি। নিজে কাজ করেই বিশ্বাস জন্মাতে আমাদের সাহায্য করেছেন। রোমাঞ্চকর সেই সব মনের কথা। দুভাগে ভাগ করে লেখাগুলি উপস্থিত করা হয়েছে।

প্রথম অংশে : 'শিশু-শিক্ষা, শিশু-পুষ্টি ও মিড ডে মিল' শিরোনামটি বুঝিয়ে দিচ্ছে লেখার ধারাটি। প্রত্যেকটি লেখার সঙ্গে অপরটির ধারাবাহিকতা সব সময় রাখা যায়নি। পড়ার সুবিধের জন্য 'বদ্যিনাথের তীর্থদর্শন' লেখাটি প্রথমেই দেওয়া হয়েছে প্রেক্ষাপটটি বোঝার জন্য। এই অংশ 'পুষ্টি' সংস্থার প্রকল্পের জন্ম, বিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি বিবৃত হয়েছে। শুকনো তথ্যের সারি নয়, তারই সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে এক অপূর্ব দরদী মনের রঙিন আশার আলো আর ইস্পাত-কঠিন এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

দ্বিতীয় অংশ : 'উন্নত জীবনযাপন ও মতাদর্শের সন্ধানে' লেখকের সমাজ চেতনার আলোয় আলোকিত 'আদিগঙ্গার তীরে' ছিন্নমূল মানুষের কথা আর তারই সঙ্গে 'লুমপেন প্রলেতারিয়েত' মিনিবাসের চালক কনডাক্টার ও হেলপারদের জানা অথচ অজানা জীবন কাহিনী। এদের নিয়ে আরও এক দায়বদ্ধতার লড়াই। তার ছোটখাটো বিবরণ শিক্ষিত আধুনিক মানুষকে তার কূপমণ্ডূকতা থেকে টেনে বের করে নিয়ে কিছু নতুন কথা শোনাবে। উন্নত জীবনযাপন করাই নয়— সেই জীবনযাপন বঞ্চিতদের কাছে নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন এক নতুন মতাদর্শগত লড়াকু মন। বিশ্বায়নের প্রভাবে সৃষ্ট উঠতি স্বচ্ছল পরিবারের কাছে হয়তো এনে দেবে উত্তর 'বাঁচার অর্থ কী'? আর সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধরনের Social commitment। ডাক্তারবাবু এর মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছেন এক অনাগত দিনের নতুন ভাষা নতুন বাণী। হ্যাঁ, বিজ্ঞানমনস্কতা তো আজকের ধর্ম— কিন্তু তার প্রয়োগ কজনই-বা আমরা করি।

এই অংশের দ্বিতীয় পর্যায়ে তত্ত্বের কথা টেনে এনেছেন আর এক বিরল ভঙ্গিতে। সবই সহজাতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— 'সুখী পরিবার'— 'বাজারের শিক্ষা'— 'মানবতার সন্ধানে'— 'অধিপত্যের গতিপ্রকৃতি'— 'ভারসাম্যের সন্ধানে' এবং 'সমাজতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্য অবিচ্ছেদ্য'।

ডা. সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ লেখার সংকলনের 'উপক্রমণিকা' লেখার যোগ্যতা আমার কতটা আছে জানি না। কিন্তু আমার একান্ত ব্যক্তিগত এই কথাগুলি বলতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

'শিশু-পুষ্টি' থেকে 'জীবনের অর্থ' পর্যন্ত এই আত্মজিজ্ঞাসার পরিক্রমা পাঠক-পাঠিকাদের সামাজিক দায়বদ্ধতায় উদ্বুদ্ধ করবে এই বিশ্বাস আমার আছে।

৬ এপ্রিল ২০০৪
বেণুবনআবাসন
৯৩/২,কাঁকুলিয়া রোড,
কলকাতা-৭০০০২৯

কমল কুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, হুগলী গভর্নমেন্ট
টিচার্স ট্রেনিং (বি.এড.) কলেজ, ও
'দৈনিক কালান্তর'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

লেখকের কিছু বলার থাকে

'জীবনের সন্ধানে' প্রবন্ধ সম্ভারের মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রকৃতি ও মানবজীবনে ঘৃণা-বিদ্বেষ-হিংসা-নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসের মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়েছি, তা থেকে মুক্তি পেতে যে ভাবনার উন্মেষ– প্রবন্ধগুলিতে তারই প্রতিফলন। ভবিষ্যৎ পৃথিবী মমতাময়ী ও মঙ্গলময় হয়ে উঠুক সে অন্বেষণে লেখক নিবেদিত।

'কালান্তর' পত্রিকায় কখনও নিজের নামে কখনও 'বদ্যিনাথ' নামে লেখাগুলি বেরিয়েছে। কালান্তর পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ কালান্তর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রী নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। যিনি আমার প্রতিটি লেখা পত্রিকায় বেরোবার আগে দেখে দিতেন। লেখার উৎকর্ষ বাড়াতে এবং আমার ভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করতে নৃপেনদা আমার কাছে শিক্ষকতুল্য। কৃতজ্ঞতা জানাই সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্রী কমল চট্টোপাধ্যায়কে, বইয়ের ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য! আমার লেখাগুলির ব্যাখ্যার ভার কমলদাকেই নিতে হয়েছে। উনি আমার হয়ে সে দায়িত্ব হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন।

সুকুমারীদি (শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্য) আমাকে খুবই স্নেহ করেন। প্রথম দিকে তিনি আমার লেখাগুলি দেখে দিতেন। তাঁর বাড়িতে গেলেই আমার নতুন লেখার কথা জিজ্ঞেস করতেন। তাই আমার বইয়ের প্রায় সব লেখাই তাঁকে দেখিয়েছি মতামতের জন্য। বইটা প্রকাশ হলে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা শিশু-পুষ্টি ও শিক্ষা নিয়ে নিরলস সংগ্রাম করে চলেছেন এবং মিড ডে মিল যাতে সার্বিকভাবে রূপায়িত হয় সে ব্যাপারে ব্রতী রয়েছেন। এ রাজ্যে এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন, শিক্ষাদপ্তরের বিশেষ-সচিব শ্রী পল্লব কুমার গোস্বামী ও প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের শ্রী কুমার রানা।

অধ্যাপক শুভেন্দু দাশগুপ্ত বইটির সংক্ষিপ্তসার লিখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার কলেজের বন্ধু গৌর-কে (ডা. গৌর মন্ডল) ধন্যবাদ জানাই বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমার পাশে থাকার জন্য।

পুনশ্চ প্রকাশনার শ্রী সন্দীপ নায়ক বইটির প্রকাশ করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী।

গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। এই ভাবনা থেকেই গ্রামের শিশুদের কথা মনে হয়েছিল। মিড ডে মিলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ১৯৯৪ সালে দুই বন্ধু মিলে শুরু করেছিলাম বীরভূম জেলার একটি গ্রামের বিদ্যালয়ে শিশুদের সিদ্ধ ডিম

খাওয়ানোর কর্মসূচি। আজ এক দশক পর দেশব্যাপী মিড ডে মিল কার্যক্রম চালু হওয়াতে আমি যে কি আনন্দিত হয়েছি তা বলার নয়। সুদূর আমেরিকা থেকে আমার ভাইপো লিখে জানিয়েছে--- "There are no expectations of rewards or fame when one sets out on a selfless path like this, but when the hard work bears fruits, it may be a time of silent joy and further firming of resolve"।

আমাদের চার পাশে বহু মানুষ আছেন যাঁরা সম্পদ সৃষ্টি করেও সম্পদহীন। ১৯৯১ সালে অসংগঠিত শ্রমজীবীদের নিয়ে গঠিত হয় সমবায়। আজ তা কলেবরে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচশোতে। আশা ছিল আরও অনেকে এই ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ হবেন এবং দুর্বলতর মানুষের আত্মশক্তি ও ভরসার প্রেরণা জোগাতে সাহায্য করবেন। কিন্তু আশাহত হয়েছি। সমবায়ের ভাবনা রাজনীতিবিদ ও সমাজবিদদের আলোচনা সভায় তাঁদের বলা ও লেখার মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেছে। মনীষীদের নিয়ে জীবনচরিত বিস্তর লেখা হয়েছে। কিন্তু অসংগঠিত শ্রমজীবীদের নিয়ে? তাই লিখেছিলাম 'মিনিবাস শ্রমিকদের জীবনচরিত'। সমবায় গঠনে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বাবরি মসজিদ ভাঙায় আমি মানসিকভাবে খুবই আহত হয়েছিলাম। এর এক বিশেষ কারণ ছিল। ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার ভয়াবহতার মধ্যে পড়েছিলাম। সেই ভয়ের স্মৃতি এখনও আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে আছে। এ ছাড়াও ইংল্যান্ডে থাকাকালীন গায়ের রং কালো হওয়ার কারণে সংখ্যালঘু হিসাবে সমাজে চিহ্নিত হয়েছি। উপলব্ধি করেছি সংখ্যালঘু মানসিকতার দীনতা। যে দৈন্য মানুষের স্বাধীন বিকাশের অন্তরায়। এই ভাবনা থেকেই আমার লেখা 'সমাধান কোন্ পথে'।

বাড়ি থেকে বেরোলেই দুর্ঘটনা আমাদের নিত্য সঙ্গী। এর থেকে কোনও জীবেরই নিস্তার নেই। সমাজটা ক্রমশ যেন অমানবিক হয়ে উঠছে। 'দুর্ঘটনা প্রতিদিনের ঘটনা', 'মানবতার সন্ধানে' এই প্রেক্ষাপটেই লেখা।

আমি ঋণী সমাজের আরও অনেকের কাছে যাঁরা আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই, শিল্পী শ্রী সমীর আইচ-কে, যিনি ভালোবেসে বইটির প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন।

পরিবারে, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বোন, দাদা, দিদি এবং অন্যান্যদের কাছে বিরক্তির কারণ হয়েও সহযোগিতা পেয়েছি। সেজন্য তাদের কাছে আমি ঋণী।

কিন্তু যেটা উল্লেখ না করলে বই প্রকাশনাটাই ব্যর্থ হবে। বই প্রকাশের ইচ্ছে আমার ছিল না। আমাদের বাড়ির কুকুর, যার নাম ছিল 'রকি'। আমার বাড়ির লোকজন ও বন্ধুরা আমাকে রকির বাবা বলেই সম্বোধন করত। রকির মৃত্যুতে আমি এতই শোকাহত হয়েছিলাম যে বলার নয়। আমার শোককে লাঘব করতে আমি মনে মনে নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম— প্রয়াত রকিকে উৎসর্গ করে আমি আমার লেখাগুলি দিয়ে বই প্রকাশ করব। 'রকি'-র স্মৃতির প্রতি আমার ভালোবাসা জানাতে এই আমার অর্ঘ্য।

শিশু-শিক্ষা, শিশু-পুষ্টি
ও
মিড ডে মিল

খেটে খাওয়া গরিব পরিবারের শিশুরা কিছু না খেয়েই পাঠশালায় আসে। খিদের পেটে তো পড়ায় মন বসে না। মিড ডে মিল শিশুদের পেট ভরাবে। ভরা পেটে শিশুদের পড়ায় মন বসবে। শরীরও ভাল হবে। এই সব শিশুদের মায়েরা ভোরে কাজে বেরিয়ে যায়। মায়েদের মন পড়ে থাকে তাদের শিশুরা দুপুরে কী খাবে ? মিড ডে মিল এই ভাবনা থেকে মায়েদের রেহাই দেবে। এতে মায়েরা-শিশুরা সবাই মিলে ভালবাসবে পাঠশালা ও লেখাপড়াকে।

তীর্থদর্শনের আগে এক দীর্ঘ পথ চলা থাকে। যেটা অতিক্রম না করলে দর্শনে তৃপ্তি মেলে না।

পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের প্রায় সব প্রাথমিক স্কুলে মিড ডে মিল চালু হয়েছে। তবে এর পিছনেও দীর্ঘ পথ চলা আছে— যেটা লেখা না হলে বদ্যিনাথের মন তৃপ্ত হবে না। তাই পথ চলার ইতিহাস দিয়েই শুরু।

১৮৮০-র দশকে প্যারিসে গরিব শিশুদের জন্য চালু হয়েছিল মিড ডে মিল। এ সম্পর্কে সমাজবাদী তাত্ত্বিক August Bebel লিখেছেন "In France where after long neglect popular education has made more progress, things have been taken at least in Paris, one step further for school children are receiving meals paid for out of public funds. ... That is already a communistic arrangement that has proved satisfactory for parents and children alike." (The Socialist Education System)

এর পর আবার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। পান্থশালায় বিশ্রাম— তার পর ঘুম। এ ঘুম যে ভাঙে না। অবশেষে ঘুম ভাঙে বিশ্বযুদ্ধের দামামায়। ইউরোপ টালমাটাল। সোভিয়েত বিপ্লব। রাশিয়ায় শুরু হয় নতুন জীবনের সূচনা। শ্রমজীবী মানুষের জীবন থেকে অনিশ্চয়তা দূর করে তোলার প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াস।

সত্তরের দশকে বদ্যিনাথ ইংল্যান্ডে থাকাকালীন দেখেছে— সে দেশেও স্কুলের সব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিবেশিত হত মিড ডে মিল। এই মিড ডে মিল দেওয়া হত সে দেশের একজন মধ্যবিত্ত পরিবার বাড়িতে যা খায় অর্থাৎ আলুর সঙ্গে কোনও দিন মাছ বা মাংস বা ডিম আর থাকত সবজি ও একটি মিষ্টির পদ। আশির দশকে প্রথম দিকে দেশে ফিরে বদ্যিনাথ নিজেকে যুক্ত করে প্রধানত মধ্যবিত্তদের অধিকারের দাবির আন্দোলনে এবং এলাকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। কেটে যেতে থাকে আশির দশক। এত ব্যস্ততার মধ্যে কোথায় যেন এক অতৃপ্তি তাকে বলতে থাকে— "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে"। তার এক অদ্ভুত উপলব্ধি হয়। সে দেখতে পায় প্রকৃতিতে মা তার বড় সন্তানের চেয়ে ছোট্ট শিশুটির প্রতি যত্ন নেয় বেশি। কারণ ছোট্ট

শিশুটির আত্মরক্ষার ক্ষমতা বড়টির চেয়ে অনেক কম। মধ্যবিত্তরা অনেক বেশি সচেতন তাদের দাবি আদায় করতে। কিন্তু সমাজে যারা আর্থিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল তাদের দিকেই তো নজর দিতে হবে বেশি— যতদিন-না তারা নিজেদের দেখভাল নিজেরাই করতে সক্ষম হয়। আর এরাই তো দেশের অধিক সংখ্যক এবং দেশের বেশির ভাগ সম্পদ এখনও সৃষ্টি করে চলেছে এরাই। এই ভাবনা নিয়েই বদ্যিনাথের গ্রামেগঞ্জে পথ চলা। গ্রামের মানুষদের পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায়, এই ভাবনা তাকে উতলা করে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল। বাবরি মস্‌জিদ ভাঙা হয় সঙ্গে ভাঙার চেষ্টা হয় মনুষ্যত্বকে। ধর্মের নামে মানুষ হত্যা, আর রাষ্ট্র এর সহায়ক। মন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকে— এটাই বিধাতার নিয়ম— এটাই নিয়তি— এটাই সত্য। বি.জে.পি. আবির্ভূত হয় রাজনৈতিক মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে। আর ত্রিশূল নিয়ে তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নেমে পড়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষ-শিশু নিধনে। এরই প্রতিবাদে বদ্যিনাথ রাস্তায় নামে। ছুটে যায়, 'কালান্তর' পত্রিকার নেতৃত্বের কাছে। তারাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকায় এবং বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় ত্রিশূল বিঁধতে পারে না এ রাজ্যের মাটিতে। তবে অনেক বুদ্ধিজীবীর মনের খোরাক দিয়ে যায় ত্রিশূলের মাথায় লাগানো ঐ সাম্প্রদায়িক বিষ। আবার শান্ত পরিবেশ। বদ্যিনাথ যুক্ত হয় 'কালান্তর' পত্রিকার সঙ্গে। কালান্তর পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যের কাছ থেকে শোনে তামিলনাড়ুতে মিড ডে মিলের কাহিনী। সেখানকার অভিভাবকদের সংগঠন ষাটের দশক থেকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল— প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের মিড ডে মিল দেওয়ার কার্যক্রম। সত্তর দশকে তামিলনাড়ুতে মিড ডে মিলের কর্মকাণ্ড দেখে সেই সদস্য অভিভূত হয়েছিলেন। এক তরুণী কর্মীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বছরে কত দিন তারা স্কুলে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন? মেয়েটির সপ্রতিভ উত্তর প্রশ্ন দিয়েই। আপনি বছরে কদিন খান? বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। এর অর্থ ছুটির দিনেও শিশুরা স্কুলে আসে।

স্কুল ও বসতবাড়ি একাকার হয়ে যায়। স্কুলটা আর অচেনা, অজানা বা বিরক্তির জায়গা থাকে না। বাড়ির মতোই স্কুল তাদের কাছে— খিদে পেলে খাওয়ার জায়গা, খেলার জায়গা আর লেখাপড়ার জায়গা তো বটেই। ১৯৮২ সালে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত এম.জি.রামচন্দ্রন, তাঁরই নেতৃত্বে, তামিলনাড়ু সরকার মিড ডে মিলের সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেয়।

এই কাহিনী বদ্যিনাথের মনকে নাড়া দেয়। এ ছাড়াও সে দেখেছে, মায়েদের সঙ্গে ছয় বছরের বয়সের নীচে শিশুদের অপুষ্টি দূর করতে অঙ্গনওয়াড়ির মাধ্যমে পুষ্টিকর আহার দেওয়ার ব্যবস্থা। তা হলে তো পরবর্তী বয়সের শিশু-অপুষ্টির কার্যক্রমই হওয়া উচিত মিড ডে মিল। প্রাথমিকের বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টির উন্নতির জন্যে মিড ডে মিলই হবে আদর্শ। তামিলনাড়ু রাজ্যে যদি এটা সম্ভব হয়ে থাকে তবে অন্যান্য রাজ্য এমনকী দেশের সব রাজ্যেই মিড ডে মিল চালু করা সম্ভব নয় কেন? এই ভাবনা থেকেই বদ্যিনাথ ভাবতে থাকে একটা মডেল তৈরি করে মিড ডে মিলের তাৎপর্যকে জনসমক্ষে ও রাষ্ট্রনায়কদের নজরে আনা যায় কীভাবে? এর জন্য চাই একটা চেনা গ্রাম— একটা চেনা স্কুল। বদ্যিনাথের এক বন্ধু, যার ভিটেমাটি আছে বীরভূম জেলার সাজিনা গ্রামে। সেখানে বন্ধুর একটা ছোট্ট মাটির বাড়িও আছে গ্রামের রাধাকান্ত রায় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ঠিক পাশেই। এবার চিন্তা আসে— মিড ডে মিল হিসাবে কী দেওয়া যেতে পারে? প্রথমে গ্রামবাসীদের ও সেখানকার শিশুদের দৈনিক আহারের সমীক্ষায় নামে বদ্যিনাথ। সমীক্ষায় বেরিয়ে আসে— গ্রামবাসীদের দুবেলা ভাত যদি-বা জোটে তবে অপুষ্টির একটা প্রধান কারণ আহারে প্রোটিন ও ফ্যাট-এর অভাব। আর শিশুদের জলখাবার, দুধ ছাড়া চা-এর সঙ্গে সামান্য মুড়ি। এ খেয়েই তারা স্কুলে আসে। এবার প্রশ্ন জাগে, স্কুলের পরিকাঠামো তো ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবে মাস্টারমশাইদের সামান্য সহযোগিতায় কী ধরনের খাবার শিশুদের মুখে তুলে দেওয়া যায় সেটাই ভাবার বিষয়। বদ্যিনাথ পুষ্টি সংক্রান্ত বই দেখতে শুরু করে। মাথায় আসে একটা করে সিদ্ধ ডিম যদি প্রত্যেক শিশুর হাতে তুলে দেওয়া যায় তাতে মন্দ কি? এতে অন্তত কিছুটা প্রোটিন ও ফ্যাট-এর চাহিদা মিটবে। মিড ডে মিলের মডেল হিসাবে এটাকেই বেছে নেয় বদ্যিনাথ ও তাঁর বন্ধু। এক বছরের খরচের আর্থিক দায়ভার তুলে নিতে রাজি হয় দুজনেই। এভাবেই ১৯৯৪ সালে শুরু হয় সাজিনা গ্রামে রাধাকান্ত রায় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল পরিবেশন করার একটা পরীক্ষামূলক মডেল। যারা বাড়ি থেকে না খেয়ে আসে আর যারা খেয়ে আসে— সিদ্ধ ডিম খাওয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহের কোনও খামতি নেই। সবাই আনন্দেই গ্রহণ করছে সামান্য এই উপহার।

কিন্তু এখানে একটা কথা না লিখলে বদ্যিনাথ প্রতারক হিসাবে চিহ্নিত হবে। বদ্যিনাথ ভুলে গিয়েছিল প্রাথমিকে পড়ার সময় টিফিনে দু পয়সার ছোলা তাঁর

কাছে ছিল অমৃত সমান। অনেক বছর কেটে গেছে। খিদে বলে যে একটা বিষয় আছে সেটা তার মাথায় আর নেই। যেটা মাথায় গোঁজা— চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'খিদে না হওয়ার কারণ'। শিশুদের খিদের পেট ভরানোর ব্যাপারটাও যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ সেটা উপলব্ধি করতে তার বেশ কিছুদিন সময় লেগেছে। বদ্যিনাথের এতদিনের বিদ্যেবুদ্ধি, বিলেতি ডিগ্রি অসার প্রতিপন্ন হয়েছে— গরিব শিশুদের খিদের মন বুঝতে। সে ভুল সে শুধরেছে এবং সোচ্চার হয়েছে, "শিশুদের পেট ভরে পুষ্টিকর আহার দিতে হবে", এই স্লোগানে।

আবার ফিরে আসা যাক, শিশু-পুষ্টির কার্যক্রমে। এক বছর সুন্দরভাবে চলে দুই বন্ধুর নেওয়া কর্মসূচি। স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এক দিকে সাফল্যের আনন্দ অন্য দিকে দুশ্চিন্তা, কীভাবে নেওয়া সম্ভব হবে আগামী বছরের আর্থিক দায়ভার? কলকাতায় তার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় বসে বদ্যিনাথ। তারাও আগ্রহ প্রকাশ করে সাহায্যের হাত বাড়াতে।

১৯৯৫ সালে গড়ে ওঠে 'পুষ্টি' সংগঠন। আলোচনায় ওঠে 'পুষ্টি'-র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে ষাট হাজারেরও বেশি প্রাথমিক স্কুল আছে। যেখানে প্রায় এক কোটি ছাত্রছাত্রী হওয়ার সম্ভাবনা। এদের সবাইকার হাতে সামান্য আহার তুলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা 'পুষ্টি' সংগঠনের কাছে অলীক স্বপ্ন। তবে রাষ্ট্র ও জনগণের সহমতেই এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে পারে। 'পুষ্টি' সংগঠন এরই ভিত্তি রচনা করতে ব্রতী।

এর পর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় 'ইতিহাস'। 'ইতিহাস' যদি মনে করে কোনও ঘটনাকে কোলে নিয়ে এগিয়ে যাবে তাকে রোধ করে কে? 'ইতিহাসের' গতির টানে ঘটনা ঘটতে থাকে দ্রুত এবং কুশীলবগণ কোন্ যাদুমন্ত্রে ইতিহাসের মঞ্চে উপস্থিত হতে থাকে তা বোঝা দায়।

১৯৯৪ সালের আগেই বিশ্বায়নের সূচনা শুরু হয়ে গেছে ভারতে। সরকার চাইছে দেশের মানুষের দায় দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিতে। 'বাজার'-ই ঠিক করবে কে বাঁচবে আর কে মরবে। সরকারের ভূমিকা থাকবে নগণ্য। চাষিরা ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করবে আর সরকার থাকবে মুখ ঘুরিয়ে। একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হতে থাকবে, শ্রমজীবীরা রাস্তার ফুটপাতে এসে দাঁড়াবে। সেখানেও সরকারের বুলডোজার পড়বে। তবুও সরকারের ঘুম ভাঙানো চলবে না। বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের বলবে নিজেদের পথ দেখে নেওয়ার জন্য— 'বাজার' তাই বলছে। শিশু মৃত্যু বাড়ে, শিশু হত্যা বাড়ে, শিশু বিক্রি বাড়ে।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাবা-মার আগল থেকে বেরিয়ে 'বাজারের' পণ্যে তাদের নাম লেখাচ্ছে। শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। আর মেয়েদের কিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 'বাজারের' খিদে মেটাতে। এ ধরনের নির্মম বিশ্বায়নের যুগেও 'বাজারের' দাপট নতজানু হয় ইতিহাসের কাছে। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য।

এ দিকে সরকারি গুদামে চাল-গম পচছে, আর অনাহারে ধুঁকছে লক্ষ লক্ষ এ দেশের মানুষ। এই অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত ওঠে। তখন বাধ্য হয়েই ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস সরকার প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য চাল বা গম বরাদ্দ করে।

এর পর এক সর্বভারতীয় মানবাধিকার সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করে, মিড ডে মিলে রান্না-করা খাবার দেওয়ার সপক্ষে। ২০০১ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোয়। রায়ে বলা হয় ২০০২ সালের মধ্যে দেশের সব প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের হাতে তুলে দিতে হবে রান্না-করা খাবার।

এরই মধ্যে একটি বেসরকারি সংগঠন 'খাদ্য ও কাজের অধিকার' এ রাজ্যে মিড ডে মিল রূপায়ণের দাবিতে আন্দোলনে নামে।

এর পর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হন— আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। যিনি জনসমক্ষে ও এ দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের কাছে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যকতা ও মিড ডে মিলের প্রয়োজনীয়তাকে। ২০০২ সালে যেখানে মিড ডে মিল পৌঁছে যাওয়ার কথা সমস্ত স্কুলে, সেখানে শুরু করতেই বিলম্ব হয়, রাজ্য শিক্ষা-দপ্তরের উদাসীনতায়। প্রাথমিকের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে দুস্থ শিশুরা মিড ডে মিল পাবে এই বিষয়টি তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে ২০০৩ সালে ১১০০ স্কুলে মিড ডে মিল শুরু হয়। নভেম্বর ২০০৪ সালে তা প্রায় ২৪ হাজারে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পনা চলছে ২০০৫ সালের মধ্যে ৫০ হাজারেরও বেশি স্কুলে এক কোটি শিশুদের মুখে মিড ডে মিল তুলে দেওয়ার। মিড ডে মিল তো শুধুমাত্র শিক্ষা-দপ্তরের নিজস্ব বিষয় হতে পারে না। যারা দেশের ভবিষ্যৎ তারা ফ্যালনা হতে যাবে কী জন্যে? সরকারের সমস্ত দপ্তরের দায়বদ্ধতা যেন থাকে আমাদের আগামী প্রজন্মের ওপর। যারা নতুন সমাজ গড়ার সংকল্প নেবে, বাজারের পায়ে বেড়ি বেঁধে দেবে, যাতে সে নিজের জায়গাতে কেবল ঘোরাফেরা করে। তার পর তারাই আবিষ্কার করবে নতুন দিশার, নতুন পথের।

বদ্যিনাথ পরিশ্রান্ত। সে একটু জিরোতে চায়। তীর্থদর্শনের কাছাকাছি সে